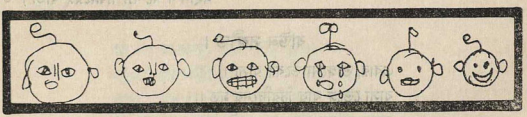

রিঙ্গনলীলা

পুথিটি হাল আমলের। লিখেছেন শ্রী কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য পুরাণরত্ন। এখন দৃষ্টিশক্তিহীন, ৯৪ বৎসর বয়স। কথিকা সম্রাজ্ঞী ভাগবতভারতী ক্ষান্তিলতা দেবী কুমুদবাবুর পত্নী, তাঁরই লেখা পালা তিনি হুবহু পাঠ করতেন। চন্দননগরের ফটকগোড়ায় এঁদের বাড়িতে হাতে লেখা নানা পালা আছে, যেমন শ্রীদামচরিত, তুলসীপূজা, সাবিত্রী আখ্যান ইত্যাদি।

ক্ষান্তিলতা দেবী পালা হুবহু পাঠ করতেন বলে পালাটিতে ব্যাখ্যা, শ্লোক ও গান বিস্তৃতভাবে রয়েছে। পুথিটির কাহিনী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, উৎস ভাগবতের দশম স্কন্ধ। কিন্তু কুমুদবন্ধু মনে করেন যে কথকতার মাত্রা সুরে বাঁধা। ফলে বার বার গদ্য থেকে সুরেলা পদ্যে যাওয়া ও ফিরে আসা বিশ্রাসে দেখা যায়।

কথকতার পুথিতেও ছাপ পড়ে সময়ের, পরিস্থিতির। মেয়ে কথকী, অনেক সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। কথকতার জবানীতেই সেই সমালোচনার জবাব দেওয়া হয়েছে। আবার নাড়ুগোপালের খেলার প্রসঙ্গে চলে এসেছে সমাজে মেয়েদের কর্তব্য, দেশের অর্থনীতির হাল ও টকি সুন্দরীর প্রভাবের কথা। তাতে তালও কাটে না, রসাভাবও হয় না; বরং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আসর জমে ওঠে। আবার সময়ের অভাব বুঝলে বা শ্রোতাদের রুচি মাফিক অংশটি যে বাদও যেতে পারে, তারও নির্দেশ দেওয়া থাকে।

পুথির আকারে কাগজ কাটা হয়েছে। সাধারণ লাইনটানা দিস্তে কাগজ। পুথিটির মোট পৃষ্ঠা ৩৩। প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল।

অপার করুণাসিন্ধু মহামহিমাময় শ্রীভগবানের বাল্যলীলা বড়ই মধুময়। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোকুলে বাৎসল্য রসনিষ্যন্দ আস্বাদনলুব্ধ শ্রী বালগোপালের শৈশবলীলা কেলীমাধুর্য, পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী চরণ বর্ণন করছেন। শুনহে উত্তরনন্দন অবহিতচিত্তে। তোমার কুলের ঠাকুরের বালোচিত রিঙ্গনলীলা যশোদানন্দন শৈশবলীলায় কুতনাবং শকটভঞ্জন তৃণাবর্ত প্রভৃতি অসুরগণকে নিহত করে শৈশবলীলামাধুর্যে মনোনিবেশ করেছেন। ইত্যবসরে দুটি ভায়ের নামকরণ অনুপ্রাশন কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে। এইবার শ্রী শুকদেব গোস্বামী মহারাজের বলবার ভঙ্গিমা শ্রবণ করুন।

কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রামকেশবৌ।
জানুভ্যাং সহ পাণিভ্যাং রিঙ্গমানৌ বিজহ্রতুঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীবলদেব ও শ্রীকেশব দুই ভাই ব্রজরাজনন্দন গৃহমধ্যে রিঙ্গনলীলা আরম্ভ করেছেন।

রিঙ্গনলীলা অর্থে—বুকে ভর দিয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে বা হামাগড়ী দিয়ে অগ্রসর হওয়া। বালকৃষ্ণের সে অদ্ভুত বালকেলির অপূর্ব দৃশ্য।

বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবান শ্রীধামবৃন্দাবন। বালকেলি করিতেছেন আনন্দিতমনে। তাঁর ভগবত্তা লুকিয়েছেন ব্রজের ধূলির মাঝে। মায়ের কোলে স্নেহস্নাত গোপবালক সেজে। বিশ্বনিয়ন্তা খেলেন নন্দের গৃহে আর অঙ্গনে। এমন গোপশিশু হলেন, কেহ নাহি জানে। বোঝে না কেউ তারে কিন্তু (কেউ) পায় না পরিচয়। যশোদা-নন্দনে এ কী, গুপ্ত অভিনয়॥

সাধারণ বালকানুকরণে তিনি আজ গোপশিশু, মাতৃস্নেহ রসনির্যাসলুব্ধ বালকবৃন্দ বিশ্বজীবকে আনন্দাতিশয্যে পরিপ্লুত করণোপযোগী শৈশব কেলিমাধুরীময় গোপাল। অসীম স্নেহবাৎসল্যবতী মা যশোমতী প্রাণভরা আনন্দের প্রতীক ও বাৎসল্য পুলকনির্মিত কুড়ু।

বেদ বলেছেন—আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ। আনন্দই ব্রহ্মের বা ভগবানের উপাদান। ওগো তিনি যে আনন্দের মূর্তি, আনন্দ উপাদানে তিনি যে গঠিত॥ (কীর্তন)

১। (ওগো) সে আনন্দঘন, মূরতিমোহন; কত ছন্দে গড়া অঙ্গ। (সে) আনন্দ সুন্দর, শিশু নটবর চিত্তহর সে যে ত্রিভঙ্গ॥

...

(কৃষ্ণ) স্নেহানন্দ সাগর উছলি দিয়েছেন, ভাসাইতে ব্রজভূমি।
কত আনন্দ তরঙ্গ, করিতেছে রঙ্গ গোকুলেতে দিবাযামী॥
(ব্রজের খেলা কেউ বোঝে না) এ রসনির্যাসের আরাধনা।
স্নেহসিন্ধু তুফান নানা ব্রহ্মাণ্ডে তার নাই তুলনা।
জীবে জানলে করার আনাগোনা। ভক্তের যে তাই উপাসনা॥...

যা হোক বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান আজ শিশু সেজে বাল্যমাধুরী ছড়িয়ে রিঙ্গনলীলায় মত্ত। তিনি বুকে ভর দিয়ে চরণযুগল আকর্ষণ বা দুখানি চরণ টেনে নিয়ে হামাগুড়ী দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। উঠে দাঁড়িয়ে পদবিক্ষেপ করতে গিয়ে তিনি পড়ে যাচ্ছেন। এ লীলা তার আশ্চর্যই বটে। এ লীলা আশ্চর্য হতে আশ্চর্যময়ী হলেও—'লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্'। লোকচক্ষে ধুলো দিয়ে ব্যক্তলীলার ভিতরে গুপ্তভঙ্গিমা রেখে লুপ্ত হয়ে আছেন।

[এর পরের অংশে গীতা ইত্যাদি থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে লীলা অভিনয়ের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

...

আমার মা-ভগ্নীগণ ও সুধীসাধক সমাজ। এই ভাগবত হচ্ছেন সাধনশাস্ত্র। এতে ভক্তিরসসিন্ধুর উত্তালতরঙ্গ নিয়তই উচ্ছ্বলিত হচ্ছে। সে তরঙ্গাহিল্লোলে সাধকসমাজ ও ভক্তমণ্ডলী আনন্দে বিভোর হয়ে ভেসে ভেসে চলেছেন। এই ভক্তিরসের আধার না হলে ভাগবতশাস্ত্রের অধিকার হয় না। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন—

এক ভাগবত হয় ভাগবতশাস্ত্র। আর ভাগবত হয় ভক্তিরসপাত্র॥ ভাগবত না হলে বা ভক্তিরসে অধিকার না হলে ভাগবত আস্বাদন করা যায় না। 'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং'। আপনারা সকলে স্থূল কথায় জেনে রাখুন ভাগবতখানাই জ্ঞানের শাস্ত্র। তার মধ্যে বিশেষতঃ ব্রজলীলা। এতে তত্ত্ব যতটা আস্বাদন করুন না করুন, লীলারস আস্বাদন করে পরিতৃপ্ত হন।…

কটুলাকণ্ঠ বজ্র কেহরিনখ, রাজত রুচির হিয়ো। মা যশোদা কৃষ্ণকে নজর লাগবার ভয়ে ব্যাঘ্রনখ তার কণ্ঠে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে স্বর্ণপদকাদি সুন্দর বক্ষস্থলে শোভা পাচ্ছে। তাই বলেছেন ধন্য সুর এ কোপাল য়া সুখ, কা শত কল্প জিয়ো। সুরদাস বলেছেন, আমার শতকল্প বেঁচে থাকবার আবশ্যক নাই। বাৎসল্যময়ী মা যশোমতী স্নেহদত্ত মাখনদধি ভোজনতৃপ্ত সহস্যবদন বালগোপালের এই সৌন্দর্য একপল-মাত্র দর্শন করে হৃদয়ে যে অনন্ত সম্পদ লাভ হয় তাতেই আমি ধন্য।…

যাহোক্ এইবার লীলা আস্বাদন করা যাক্। পরমহংস-শিরোমণি শুকদেবজী বলছেন, মহারাজ শ্রবণ করুন…শ্রীকৃষ্ণের চরণনূপুর ও কটির কিঙ্কিণী অতীব মধুর ঝংকারে বাজছে, দুজনে প্রতিযোগিতা করতঃ নিজ নিজ ঝংকার মাধুর্যে কলহে রত অর্থাৎ কিঙ্কিণী আর নূপুর কলহ বা ঝগড়া আরম্ভ করেছে। কিঙ্কিণী নূপুরকে বলছে—

মঞ্জীর! সিঞ্জসি কিং গুঞ্জন রবৈর্জিতং জিতস্ত্বনিশং; স্থিতঃসন্ পাদয়োরিতি শ্যাম-সুন্দরস্য কিন্তে গৌরবম্। নীচত্বমাপ্তবতস্তে ভণিত মন্যায্যং বিদ্ধি তে পরং; স্তব্ধং কুরুষ্ব বাক্যং তে ঝণৎকার মুবাচেতি কিঙ্কিণী॥ বালকৃষ্ণের কটির কিঙ্কিণী বলছে এ মঞ্জির বা হে নূপুর তুমি গুঞ্জনরবে সিঞ্চন করতঃ যারা মাতৃজাতিকে ঘৃণা করেন, তারা নারীজাতি মাতৃমুখোচ্চারিত না শিখে এবং তারা মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে তাদের পিতৃভাষায় কথা বলা উচিত। নয়তো তাদের পাণ্ডিত্য গৌরবে একটি নিজভাষা তৈরী করে সেই ভাষায় কথা বলুন। ঘৃণিতা নারী মায়ের ভাষায় কথা বললে তার পুরুষত্বে হানি হওয়াই সম্ভব।

তারপর আরো একটি কথা বলি—ছোট ছেলে অর্ধোস্ফুট অক্ষরে কথা বলে যখন বা-বা-বা-বা বলে যাকে তাকে বাবা বলে ডাকে।…তখন মা-ই 'তাকে কোলে ধরে' শিখিয়ে দেন; অমুক তোর বাবা, তোর বাবা অন্য কেউ নয়। সুতরাং বাবাকে চিনিয়ে দেওয়া প্রথম গুরুই মা…একথাও তারা যে দয়া করে ভুলে না যান। মাতৃপালক্ষী যাদের ঘরে তাদের আবার অভাব কিসের তাদের মাঠভরা শস্য থাকবে, ঘরভরা ঐশ্বর্য থাকবে, ভাণ্ডার ভরা ধনরত্ন থাকবে, এবং পেটভরা অন্ন থাকবে। কিন্তু আমাদের মা-ভগ্নীগণ! আপনাদের কাছে একটু বলি—এখন আমরা বুঝছি আমরা মাতৃত্বের ভান করে ঘরে থাকি; কিন্তু আমাদের ঘরে নাই ঐশ্বর্য, ভাণ্ডারে নাই ধনরত্ন, পেটে নাই অন্ন, মাঠে নাই শস্য, সবগুলোরই অভাব।

...

'যেদেশের ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজো হয়, যাদের প্রতিঘরে মাতৃরূপিণী লক্ষ্মী নিত্যই বিরাজিতা তাদের অভাব মিটাবার জন্য, যারা লক্ষ্মীকে চেনে না, লক্ষ্মী কাকে বলে জানে না, সেইদেশ থেকে চাল ধার করে' এনে আমাদের ভারতসন্তানসন্ততি গণের পেটের অন্নসংস্থান করতে হয়, এ দুঃখের কথা বলবো কার কাছে ? ...

আর আমাদের ভারতের সেই আদর্শ নারীর অবনতি, কতদূর নিম্নস্তরে নেবেছে তা আমরা ধারণায়ও আনতে পারিনা। আজ আমাদের ভারতনারীর বিশেষতঃ বঙ্গনারীর বিলাসিতার উত্তালতরঙ্গে শুধু ভারত কেন, বিশ্বখানা প্রায় ডুবুডুবু। আমাদের সখীত্ব টাকসুন্দরীর সঙ্গে, চলনে বলনে বস্ত্রে গহনায়। সেদিকেই আমরা দৃষ্টি রেখে কোন অজানা অন্ধকারময় অধঃপতনের দিকে ছুটে চলেছি, তার ঠিক নাই। কোথায় এর অবসান হবে ; তা আমাদের জানা নাই। আমরা সন্তান পালন করতে শিখি নাই, সন্তানকে শিক্ষা দিতে শিখি নাই। কেবল সবাইকে বলে বেড়াই—আজকাল ছেলেরা বড় অবাধ্য, একদম কথা শোনে না। এর ঘোল আনা দোষ যে মায়ের, গৃহলক্ষীদের। বিলাসিনী হয়ে তারা একথা স্বীকার করতে চান না। যতক্ষণ সন্তানের কল্যাণসাধন করবো, সন্তানের মঙ্গলের জন্য ব্রতঅনুষ্ঠান করবো ; যতক্ষণ বসে পুত্রকে সুশিক্ষা দেবো, সে সময়টা আমরা বৃথা মনে করি, ততক্ষণ শ্রীযুক্তা সিনেমাদেবীর চরণসেবা করে আসি, জীবন সার্থক হবে। কিন্তু আপনারা মাতৃজাতি জেনে রাখবেন—সন্তানের সুশিক্ষার ভার সন্তানের কল্যাণের ভার সন্তান পালনের ভার একমাত্র নারীদের।...

[এই অংশটি বাদ বলে পুঁথিতে লেখা আছে]

দুই-তিন বৎসরের ছেলে উঠোনে অন্যান্য ছোট ছেলেদের সঙ্গে বেলা দশটার সময় অঙ্গনে ধুলোখেলা করছে। তার সর্ব্বগায়ে 'ধুলোমাটি মাখা'। তার স্নেহময়ী মা ছেলের কল্যাণে পঞ্চাশটাকা দামের একখানা গরদের শাড়ী পরিধানকরতঃ ঠাকুরঘরে ষষ্ঠীপূজার 'ব্রতিনী'। ছেলের পিতা একখানি চার-পাঁচ টাকা দামের কাপড় পরে কোথায় বাইরে বেরুচ্ছেন। যেইমাত্র প্রাঙ্গণে এসেছেন, অমনি 'ছেলেটি বাবা আমি যাবো, বাবা আমি যাবো' বলে দৌড়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরতে গেছে। বাবা তো কাপড়খানা ধুলো লেগে ময়লা হবার ভয়ে এক হাত দিয়ে ছেলেকে দূরে সরিয়ে রেখে, পাশ কাটিয়ে দ্রুতপদে চলে গেলেন। ছেলেটি তো বাবা বাবা বলে কেঁদে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগলো। বাবার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই ; তিনি গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন।

এদিকে ঠাকুরঘর থেকে মা সেই ছেলের কান্না শুনতে পেয়ে পূজা ফেলে ছুটে এসে দেখেন ছেলে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে। স্নেহময়ী মা তখন আর কোন 'বিচার না করে' টপ্ করে' ছেলেটিকে ধুলোর ভেতর থেকে বুকে তুলে নিয়ে, তার সেই মূল্যবান গরদের বস্ত্রের অঞ্চল দিয়ে, ছেলের অঙ্গের সমস্ত ধুলোমাটি মুছে পরিষ্কার করে' ; শিশুর অশ্রুজল মুছিয়ে দিয়ে স্তনটি তার মুখে দিয়ে তাকে পরিতৃপ্তি করতঃ তার সকল ব্যথাপনোদন করলেন। সুধীসমাজ ও আমার মা-ভগ্নীগণ

এইখানে পিতৃ-মাতৃস্নেহের তুলনা করুন। এবং বিচার করে বুঝুন। বাবা পাঁচটাকা দামের কাপড়ের মায়ায় পুত্রস্নেহ উপেক্ষা করলেন। আর মা পঞ্চাশটাকা দামের কাপড়কে উপেক্ষা করে স্নেহকাতরা হয়ে পুত্রকে বুকে ধরে স্তনপান করালেন।

[নারীর অধিকার বলে পৃথির মার্জিনে লেখা হয়েছে]

……আরেক সম্প্রদায় আছেন, তাঁরা নারীজাতিকে ঘৃণাদৃষ্টিতে দেখেন ও নাসিকাকুঞ্চন করেন। তাঁরা ভুলে যান যে তাঁরা নারীর গর্ভেই জন্মেছেন, নারীর স্তন পেয়ে পুষ্ট হয়েছেন……নারীর বেদে অধিকার নেই বলে তারা সর্বদা লাঠি হাতে করে বেড়ান পেলে এক ঘা মারবেন। আচ্ছা সুধীসমাজ! আপনারা দৃক্‌পাত করুন।

যে বেদ বেদ বলে তাঁরা চিৎকার করেন, সেই বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্ছেন গায়ত্রী। যে মন্ত্র ব্রাহ্মণগণ জপ করেন, সেটি হলো সাবিত্রীমন্ত্র, এরা সকলেই স্ত্রীলোক। তারপর দেবসমাজ সম্মিলিত হয়ে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্ণয়ের জন্য বহু চেষ্টা করে দেবসমাজে কোন যজ্ঞ পুরুষ না পেয়ে শেষকালে একটা মূর্খ নারী সরস্বতীকেই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্ণয় করে দিলেন। যার উপরে একমুহূর্ত না দাঁড়ালে আমরা বাঁচিনা, তিনিও স্ত্রীলোক, পৃথিবীদেবী। কী বলবো, এক সম্প্রদায় বলেন স্ত্রীলোকের মুখের কথা উপদেশশাস্ত্র শুনতে নাই। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে—তাঁরা সর্বদাই স্ত্রীলোকের মুখ থেকে যা শুনেছেন, তাই বলছেন। যে যা ভাষা বলে সেটি তার মাতৃভাষা। হিন্দুস্তানের মাতৃভাষা হিন্দী, ইংরাজের মাতৃভাষা ইংরাজী, পার্সিয়ানের মাতৃভাষা পার্সী। বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলা। জগতে প্রত্যেকেই তাঁরা মায়ের কাছ থেকেই ভাষা শেখেন।

দিবানিশি জিতং শব্দ করছ কেন আমি যে তোমার চেয়ে ঊর্ধ্বে শ্যামসুন্দরের কটিতটে অবস্থান করি।

……নূপুর বলে ওহে কিঙ্কিণী তুমি কী শ্যামসুন্দরের সব কিনে নিয়েছ? তখন কিঙ্কিণী বলে নহি নহি—

আমি নিয়েছে কৃষ্ণের কটি কিনি
তালে তালে বাজে ঝিঞ্জিনী
আর কী নূপুর তোমায় গনি,
কটি বেঁধে আমি আনন্দিনী……

আমার সঙ্গে তোমার তুলনাই হয় না তবু ছোট মুখে বড় কথা কেবল বজিতং ২ বলো কেন ?…

আরে কিঙ্কিণী তুমি বলেছো। কৃষ্ণের ধূলোমাখা পায়ে থাকো বলে তুমি অতি হীন মূর্খ আরে মূর্খতমা কিঙ্কিণী—। শ্রীকৃষ্ণের চরণরজমাহাত্ম্য তুমি জান না। যে রজকণা প্রাপ্তির জন্য যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রগণ যুগযুগান্ত ধ্যানমগ্ন, যে রজঃকণা পাবার জন্য দেবেন্দ্র বাসব নন্দনজাত পারিজাত প্রসূনে শ্রীকৃষ্ণচরণযুগল অর্চনা করে করজোড়ে দণ্ডায়মান সেই চরণরজঃ গায়ে মেখে আমি ধন্য হয়ে কী করি জানো ?……

১. যে চরণরজঃ, যোগীন্দ্র দুর্লভ জীবেরে মুক্তিদানে।
যে চরণখানি গয়াসুর আনি শিরে ধরি ধন্যমানে ॥
২. (বলি) যে চরণ পেয়ে, সর্বস্ব দানিয়ে মস্তকে ধরিল তায়।
যে পদ পরশি অহল্য পাষাণ, পাইল মানবীকায় ॥
৩. যে পদ পরশি, কাষ্ঠতরীখানা, সোনার তরণী হলো।
যে পদচিন্তন করি সাধুগণ, মুকতিরতন পেলো ॥...

বলি (সেই চরণে আমি থাকি) বিশ্ব যে পদে প্রণতি করে.....তুমি কটিতে থাকিয়া দাও গো ফাঁকি। (আমি) বেজে প্রভুর নটন দেখি।
(আমি তো জয় করেছি) বিশ্বারাধ্য কৃষ্ণচরণ ছন্দিত নন্দিত আমি দেবারাধ্য রাঙ্গাচরণ মরণ বারণ অরুণ বরণ সে চরণ জয়। জিতং জিতং তাইতো বলি কেন বলিবো না বলো রিনিঝিনি বেজে তালে তালে বল হরি বোল হরি বলে।

ভক্তগণ বলছেন, ও ঠাকুর, কী করেছো আমরা এত অগুরু চন্দনচন্দন প্রস্তুত করে তোমায় কত ডাকাডাকি করি, কত অর্চনা করি, দেবেন্দ্র-মুণীন্দ্রগণ কত সুগন্ধি দ্রব্য সাজিয়ে শত উপাচারে অর্চনা করবে বলে কতভাবে তোমাকে আহ্বান করছেন, কই সেদিকে তুমি একবার ফিরেও তাকাও না। সে সমস্ত শত উপচারে আহ্বানে অর্চনার পূজামণ্ডপে রত্নসিংহাসনোপরি তোমাকে খুঁজে না পেয়ে, খুঁজতে ২ বৃন্দাবনে নন্দের অঙ্গনে এসে দেখি তুমি হর্ষাপ্লুত চিত্তে গায়ে কাদা মাখছো? আরে ছ্যা ছ্যা ॥ লোকে দেখলে কী বলবে তুমি যে ভগবান এমনি করে গোয়ালার ঘরে এসে, তাদের উঠনের কাদা মেখে ২ হাসছ? মুছে ফেলো মুছে ফেলো। লোকে দেখলে হাসবে যে আর করতালি দিয়ে বলবে এই যা কাদামাখা গোপশিশু, কাদামাখা গোপশিশু, কেউ তোমাকে ভগবান বলবে না।

ওসব ছেড়ে গায়ের কাদা মুছে ফেলে চলে এসো ঠাকুর আমরা তোমাকে রত্নসিংহাসনে বসিয়ে তোমার অঙ্গে সুগন্ধি চন্দনাগুরু প্রভৃতি দিয়ে কত শত উপচারে কত উপহারে তোমার অর্চনা করবো। তুমি যে ঠাকুর ভগবান তা ভুলে গেলে?

(তখন কৃষ্ণ) আশাবরী

১. ব্রজে আমি নই ভগবান, তোমরা যেন ভুল করো না।
দিক্ না সবাই করতালি তাতে আমার মান যাবে না ॥
২. (তোমরা) দাঁড়ায়ে ব্রজের বাহিরে, (মোরে) ভগবান ভগবান করে ;
বাধা দিলে খেলায় মোরে (আমার) ব্রজের খেলার ভাব জান না ॥
৩. অন্যের দেওয়া চন্দ্রাচন্দন তাতে তুষ্ট নয় আমার মন ;
গোপীর রাগাত্মিকা ভজন, বিধিমার্গে যায় না জানা ॥ □